Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 289–295
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মুকুল খাসনবিশের পাঁচ পুরুষের উপাখ্যান : সময়, জীবন ও উপলব্ধির মেলবন্ধন

প্রণব কুমার দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : pkdjayanta@gmail.com

Keyword
সময়, বাঙালি, মুকুল খাসনবিশ, উপন্যাস, সমাজলব্ধ অভিজ্ঞতা, শৈশবের স্মৃতি, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য

Abstract

> "কাল-বোধ হল আবশ্যিক (= পূর্বতঃসিদ্ধ), যা সমস্ত অনুভবের অন্তরালে বিদ্যমান। অর্থাৎ কাল (বা কাল-বোধ) হল সমুদয় অনুভবের অপরিহার্য আবশ্যিক শর্ত। কালবোধ বা কাল যে অপরিহার্য ও আবশ্যিক তা এভাবে প্রতিপাদন করা যায় : যা কিছু আমাদের কাছে অবভাসিত হয়, অর্থাৎ আমাদের সমস্ত অনুভব–বাহ্য অনুভব এবং অন্তর অনুভব কালিক সম্বন্ধে (আগে, পরে, একসঙ্গে, এখন, তখন, এপ্রকার সম্বন্ধে) অবভাসিত হয়। কালিক আকারে আকারিত না হয়ে কোন কিছুই আমাদের অনুভবের বিষয় অর্থাৎ অবভাস হতে পারে না।"[১]

(সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য : পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, আগস্ট, ২০১০, পৃ. ৩১৬)

এখানে সময় সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। সময় অখণ্ড, তাকে নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে ভাগ করে দেখা যায় না। সময় নিজস্ব গতিবেগে চলতে থাকে। আমাদের চারপাশে যা ঘটে থাকে, তাকে আমরা নিজেদের সুবিধার্থে ভাগ করে দেখি। জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে যা যা ঘটছে তা অখণ্ড সময়ের অন্তর্ভুক্ত। একজন সাহিত্যিক শুদ্ধ অনুভবের দ্বারা জগতের কোনো ঘটনাকে উপলব্ধির মেলবন্ধনে প্রকাশ করেন। সেই প্রকাশের সঙ্গে সময় ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে থাকে। আবার এই কথাও সত্য ঘটনার হুবহু অনুকরণ তাকে সাময়িক জনপ্রিয়তা দিলেও, পরবর্তীতে তিনি কালের স্রোতে হারিয়ে যাবেন। লেখক সচেতনভাবে ও শুদ্ধ অনুভবের দ্বারা সময়কে নিয়ে একপ্রকার খেলা করেন। একজন লেখকের সৃজনী শক্তির উপরই নির্ভর করে তিনি কালের ধারায় জয়ী হবেন কি-না? একটি লেখা বা একজন লেখক অখণ্ড সময়কে প্রকাশ করতে পেরেছেন কিনা তার উপর নির্ভর করে তাঁর কালোত্তীর্ণ হবার বিষয়টি।

মুকুল খাসনবিশের 'পাঁচপুরুষের উপাখ্যান' পুরোপুরিভাবে জীবন ও সমাজ নির্ভর সৃষ্টি। লেখকের বাস্তব সমাজলব্ধ অভিজ্ঞতা ও সময়জ্ঞান আলোচ্য উপন্যাসে ধরা পড়েছে। লেখক জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি ও অনুশীলন করেছেন বলেই আলোচ্য উপন্যাসে এর প্রভাব পড়েছে। কাহিনি, চরিত্রনির্মাণ, সংস্কৃতি, লোকাচার, খাদ্যাভাস, বাসস্থান ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই একটা গতিময় পরিচিতি ও বাঙালিয়ানা পরিবেশের মিল রয়েছে। বাঙালিদের সুখ-দুখ, আশা-

নিরাশা, ভালোবাসা-ঈর্ষার হুবহু চেনা ছবিটি আলোচ্য উপন্যাসে ধরা পড়েছে। লেখক উপখ্যানের শুরুতে ভূমিকা অংশে নিজেই বলেছেন –

> "তবু যে লিখলাম, তার কারণ এই গ্রন্থের কিছুসংখ্যক চরিত্র কাল্পনিক নয়। রক্তমাংসের মানুষ রূপে তারা একসময় এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল। শৈশবে এদের কাহিনী একজন বৃদ্ধা আত্মীয়ার মুখে গল্পকথার মত শুনেছিলাম। যদিও এই কাহিনীর সব কথা বুঝার মত বয়স আমার ছিল না।"

পরবর্তী সময়ে লেখক শৈশবের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে আলোচ্য উপখ্যানটি নির্মাণ করলেন। সেইসঙ্গে তিনি ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাসকে বিশেষত উপন্যাস রচনার ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রয়াস নিয়েছেন এর মাধ্যমে। লেখকের নিজের লেখনীশক্তির উপর বিশ্বাস কম থাকলেও, প্রথম উপন্যাস রচনায় তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন তা বলার সুযোগ নেই। লেখক গল্প বলার ঢঙেই মূল উপাখ্যানটি নির্মাণ করেছেন। তিনি সহজ সরল ভাষায় কাহিনির বিষয়ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মূল কাহিনির পাশাপাশি শাখা কাহিনির বুনুনের দিকেও লেখকের যথেষ্ঠ নজর ছিল। যদিও চরিত্রগুলোর অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের তুলনায় বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়টি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। লেখক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ঘটনাকে সাজালেও কাহিনির অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বটি সঠিকভাবে গুছিয়ে আনতে পারেননি। তবু লেখক অখণ্ড সময়ের কথা মাথায় রেখেই পাঁচপুরুষের জীবনালেখ্য সৃষ্টি করলেন।

Discussion

> "কাল-বোধ হল আবশ্যিক (= পূর্বতঃসিদ্ধ), যা সমস্ত অনুভবের অন্তরালে বিদ্যমান। অর্থাৎ কাল (বা কাল-বোধ) হল সমুদয় অনুভবের অপরিহার্য আবশ্যিক শর্ত। কালবোধ বা কাল যে অপরিহার্য ও আবশ্যিক তা এভাবে প্রতিপাদন করা যায় : যা কিছু আমাদের কাছে অবভাসিত হয়, অর্থাৎ আমাদের সমস্ত অনুভব – বাহ্য অনুভব এবং অন্তর অনুভব কালিক সম্বন্ধে (আগে, পরে, একসঙ্গে, এখন, তখন, এ প্রকার সম্বন্ধে) অবভাসিত হয়। কালিক আকারে আকারিত না হয়ে কোন কিছুই আমাদের অনুভবের বিষয় অর্থাৎ অবভাস হতে পারে না।"[১]

উপরের বাক্যগুলোর মধ্যে সময় সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। সময় অখণ্ড, তাকে নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে ভাগ করে দেখা যায় না। সময় নিজস্ব গতিবেগে চলতে থাকে। আমাদের চারপাশে যা ঘটে থাকে, তাকে আমরা নিজেদের সুবিধার্থে ভাগ করে দেখি। জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে যা যা ঘটছে তা অখণ্ড সময়ের অন্তর্ভুক্ত। একজন সাহিত্যিক শুদ্ধ অনুভবের দ্বারা জগতের কোনো ঘটনাকে উপলব্ধির মেলবন্ধনে প্রকাশ করেন। সেই প্রকাশের সঙ্গে সময় ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে থাকে। আবার এই কথাও সত্য ঘটনার হুবহু অনুকরণ তাকে সাময়িক জনপ্রিয়তা দিলেও, পরবর্তীতে তিনি কালের স্রোতে হারিয়ে যাবেন। লেখক সচেতনতভাবে ও শুদ্ধ অনুভবের দ্বারা সময়কে নিয়ে একপ্রকার খেলা করেন। একজন লেখকের সৃজনী শক্তির উপরই নির্ভর করে তিনি কালের ধারায় জয়ী হবেন কি-না? একটি লেখা বা একজন লেখক অখণ্ড সময়কে প্রকাশ করতে পেরেছেন কিনা তার উপর নির্ভর করে তাঁর কালোত্তীর্ণ হবার বিষয়টি।

'পাঁচপুরুষের উপাখ্যান' পুরোপুরিভাবে জীবন ও সমাজ নির্ভর সৃষ্টি। লেখকের বাস্তব সমাজলব্ধ অভিজ্ঞতা ও সময়জ্ঞান আলোচ্য উপন্যাসে ধরা পড়েছে। লেখক জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি ও অনুশীলন করেছেন বলেই আলোচ্য উপন্যাসে এর প্রভাব পড়েছে। কাহিনি, চরিত্রনির্মাণ, সংস্কৃতি, লোকাচার, খাদ্যাভাস, বাসস্থান ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই একটা গতিময় পরিচিতি ও বাঙালিয়ানা পরিবেশের মিল রয়েছে। বাঙালিদের সুখ-দুখ, আশা-নিরাশা, ভালোবাসা-ঈর্ষার হুবহু চেনা ছবিটি আলোচ্য উপন্যাসে ধরা পড়েছে। লেখক উপখ্যানের শুরুতে ভূমিকা অংশে নিজেই বলেছেন –

> "তবু যে লিখলাম, তার কারণ এই গ্রন্থের কিছুসংখ্যক চরিত্র কাল্পনিক নয়। রক্তমাংসের মানুষ রূপে তারা একসময় এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল। শৈশবে এদের কাহিনী একজন বৃদ্ধা আত্মীয়ার মুখে গল্পকথার মত শুনেছিলাম। যদিও এই কাহিনীর সব কথা বুঝার মত বয়স আমার ছিল না।"

পরবর্তী সময়ে লেখক শৈশবের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে আলোচ্য উপখ্যানটি নির্মাণ করলেন। সেইসঙ্গে তিনি ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাসকে বিশেষত উপন্যাস রচনার ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রয়াস নিয়েছেন। লেখকের নিজের লেখনীশক্তির উপর বিশ্বাস কম থাকলেও, প্রথম উপন্যাস রচনায় তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন তা বলার সুযোগ নেই। লেখক গল্প বলার ঢঙেই মূল উপাখ্যানটি নির্মাণ করেছেন। তিনি সহজ সরল ভাষায় কাহিনির বিষয়ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মূল কাহিনির পাশাপাশি শাখা কাহিনির বুনুনের দিকেও লেখকের যথেষ্ঠ নজর ছিল। যদিও চরিত্রগুলোর অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের তুলনায় বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়টি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। লেখক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ঘটনাকে সাজালেও কাহিনির অভ্যন্তরীন দ্বন্দটি সঠিকভাবে গুছিয়ে আনতে পারেননি। তবু লেখক অখণ্ড সময়ের কথা মাথায় রেখেই পাঁচপুরুষের জীবনালেখ্য সৃষ্টি করলেন।

এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ফুলেশ্বরী নদীর পাশে নীলগঞ্জ গ্রামের ব্রাহ্মণ রাজচন্দ্র মজুমদারের পরিবারের কাহিনি দিয়ে। নীলগঞ্জ খুবই সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামটি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারটি পাড়া নিয়ে বিভক্ত। গ্রামের পাড়াগুলিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, ছুতার, তেলী, মালী, কৈবর্ত, নমশূদ্র, মুসলমান ইত্যাদি সব শ্রেণীর লোক বাস করে। গ্রামবাসীদের সবার সঙ্গেই নিজেদের সুসম্পর্ক রয়েছে। ঝগরা বিবাদ হয় না যে এমন নয়, হলেও নিজেরা বসে মিটিয়ে নেয়। গ্রামের উর্বরা জমিতে ধান, পাট, তিল, সরিষা, আঁখ ইত্যাদির চাষ করে তারা সুখে জীবন যাপন করছে। গ্রামের প্রত্যেকেই যে যার বৃত্তি অবলম্বন করে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই উপাখ্যানটি মূলত রাজচন্দ্র পরিবারের উঠা-নামার নানা সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে এগিয়ে গেছে। নিজের বংশকে টিকিয়ে রাখার যে লড়াই তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। কখনো কখনো ধর্ম ও জ্ঞানের ভারী কথার বাড়াবাড়িতে উপন্যাসে কাহিনির বাস্তব ভিত্তিটি অসাড় লেগেছে। সবকিছুতেই একটা ঈশ্বর বিশ্বাসী মনোভাব কাহিনির উপর প্রভাব ফেলেছে।

> "গেরুয়া ধারণ করলেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়? এইত তুই গেরুয়া পরে রয়েছিস, কিন্তু সন্ন্যাসী হতে পেরেছিস কি? প্রকৃত সন্ন্যাসী হতে গেলে একজন্মের সাধনায় হয় না। জন্মজন্মান্তরের সাধনা সুকৃতি থাকলে তবেই হয়। পার্থিব ভোগ খণ্ডন না হলে মনে ত্যাগ আসে না, ত্যাগ না হলে শুদ্ধি আসে না, শুদ্ধি না আসলে সন্ন্যাস হয় না।"[২]

নীলগঞ্জ গ্রাম ও রাজচন্দ্র পরিবারের সঙ্গে জেলে সম্প্রদায়ের মেয়ে চন্ডীর বিশেষ যোগ রয়েছে। এই সমাজে জাতপাতের বড় বালাই থাকলেও, মানবিকতা ও মনুষ্যত্ববোধের বিষয়টি একেবারে মুছে যায়নি। এই উপন্যাসে চন্ডী চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক জাতপাতের ঊর্ধে উদার মানবিকতার মহানতম দৃষ্টান্তটি স্থাপন করলেন। বালবিধবা চন্ডী সম্পর্কে লেখকের এই দুটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ –

> "ঢেঙ্গা, রোগা, চেহারা, ধূমসা কালো গায়ের রং, উচুঁ দাঁত, মাথায় রুক্ষ কটা ঘন দীর্ঘ চুল। যেমন কুৎসিত চেহারা তার তেমনি অপয়া সে।"[৩]

> "চন্ডীর কুৎসিত চেহারা, ক্ষেপা স্বভাব, অকারণে অক্লান্ত শ্রম, উদ্দ্যেশহীন সঞ্চয় প্রবণতা, ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে গ্রামের মধ্যে সে এক উপহাসের পাত্রী ছিল।"[৪]

সেই মেয়েই মানুষের জন্য যা করে দেখাল, তা ঐ গ্রামের কোন পুরুষ ভাবতেই পারেনি। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চণ্ডী যা রোজগার করেছে তা দিয়েই সে গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য একটি পাকা সেতু নির্মাণ করে। কারণ, প্রতিবছর বর্ষায় ফুলেশ্বরী নদীতে নৌকা পারাপারের সময় নৌকাডুবিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। আসলে চন্ডী ছোটজাতের মেয়ে হলেও অসম্ভব বুদ্ধিমতী ও বাস্তব সম্পন্না ছিল। লেখক নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্য্যকে প্রাধান্য না দিয়ে তার চিন্তা, চেতনা ও কাজের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে লেখক চণ্ডীর মধ্য দিয়ে অখণ্ড সময়ের কর্মঠ নারীর একটি রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। নারীরাও যে সমাজের কল্যাণার্থে এগিয়ে এসেছিল, তার কাজের মধ্য দিয়েই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শিক্ষা সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি

আলোচ্য উপন্যাসে আলোকপাত করলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থাকলেও, উচ্চশিক্ষা লাভে কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের পরিবারগুলোরই প্রাধান্য ছিল। গ্রামের মেয়েদের পড়ার বিষয়ে তখনকার মানুষদের ততটা আগ্রহ ছিল না। উপন্যাসে সে দিকটি প্রায়শই উঠে এসেছে। তবে উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে আমরা লক্ষ্য করলাম মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছে। বিশেষত কমলিনীর মেয়েরা ত্রিপুরায় এসে নিজ নিজ কর্মদক্ষতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রাজচন্দ্র অধ্যাবসায় ও বুদ্ধির গুণে বিত্তবান ছিলেন। সেইসঙ্গে ব্যক্তিত্বে, সততায়, চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তিনি এই গ্রামের মানুষের মনে শ্রদ্ধার একটি আসন তৈরি করেছিলেন। তার ছোট ভাই ঈশানচন্দ্রের স্বভাব ছিল পুরোপুরি বিপরীত। একজন সৎ, কর্মঠ, পরোপকারি; অন্যজন অলস, অকর্মণ্য, লোভী। একদিকে নিঃসন্তান রাজচন্দ্রের মনে অসীম যন্ত্রণা, অন্যদিকে ঈশান বড়ই সুখী, বহু সন্তানের জনক। ছোট ভাইয়ের পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাজচন্দ্র নিজ সম্পত্তির ছয় আনা অংশ তাকে দান করেছেন। এতকিছুর পরেও ঈশানের মন, মেজাজ, স্বভাব পাল্টাইনি। দাদার প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধটুকুও নেই, সন্মান নেই বরং একটা উপেক্ষার ভাব আছে। এই চারিত্রিক স্বভাবটি পরবর্তীতে তার সন্তানদের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করেছি। উল্টোদিকে রাজচন্দ্রের সন্তানদের মধ্যে বাবার মতোই নম্র, ভদ্র, সহৃদয়তার স্বভাবটি বুদ্ধি, বিচার-বোধের চমৎকার মেলবন্ধনে প্রকাশ পেতে দেখেছি।

রাজচন্দ্র ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি অভাসবশতঃ প্রতিদিন পুত্র লাভ ও দেবীর দর্শনের জন্য প্রার্থনা করতেন। একদিন দশভূজা দুর্গা তার পরম ঐশ্বর্যময়ী রূপ নিয়ে ভক্তের কাছে হাজির হয়। কিন্তু মহাশক্তির এই রূপ সহ্য করতে পারেনি রাজচন্দ্র। দেবী প্রথমার তাকে অভিশাপ দিলেও, দ্বিতীয়বার তাকে আশীর্বাদ করে –

> "আমাকে ডেকে এনে আমার রূপ সহ্য করতে পারলিনা তুই? ধিক তার ভীরুতায়, ধিক তোর সাধনায়, বুঝলাম নির্বংশ হওয়াই তোর ললাট লিখন। নির্বংশ হবি তুই।"[৫]

> "রাজ তোর পূজায় তুষ্ট আমি। তবে আমার দর্শন আর কোনোদিন পাবি না তুই। যে আমার দিব্যরূপ দেখে জ্ঞান হারায় তাকে আর দর্শন দেই না আমি। আর নির্বংশ হওয়ার কথাটা যখন বলে ফেলেছি তাতো আর খণ্ডন হবার নয়। পুত্রসন্তান হবে না তোর। আমার বরে কন্যাসন্তানের দ্বারা তোর বংশ রক্ষা হবে। নয়টি কন্যাজন্মাবে। কিন্তু একটি মাত্র কন্যা সন্তানলাভ করবে ও তোর বংশ রক্ষা করবে।"[৬]

এর পর তার ঘরে একে একে নয়টি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সে সময়ে প্রচলিত ছিল না। প্রথমে যমজ দুই মেয়ে নীলমণি ও গঙ্গামণি। তার পরের তিনটি মেয়ে পর পর মারা যায়। ছয় নম্বরে জন্ম নেয় গুনমণি। তার পরে আরো দুট মেয়ে মারা যায়। সব শেষে জন্ম নেয় নবদুর্গা। তাদের শৈশবের কোনো কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়নি। নীলমণি ছিল রাজচন্দ্রের খুব আদরের, তাকে গরীব ঘরের ছেলে উল্লাসচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রেখে দেন। একইদিনে শিক্ষিত রূপবান কোটীশ্বরের সঙ্গে গঙ্গারও বিয়ে দিয়ে দিলেন। একটি বিষয় বেশ চমৎকার ঠেকেছে, দুই কন্যার বিয়ে দেওয়ার পর বৃদ্ধা মায়ের নবম গর্ভে জন্ম নিল নবদুর্গা। ঐদিকে বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই নীলমণি মারা যায়। এক গুণীন বললেন তাকে নাকি কেউ বাণ মেরেছে। গ্রাম বাংলার লোকবিশ্বাসের এমন বহু উদাহরণ আলোচ্য উপন্যাসে রয়েছে। অন্যদিকে গঙ্গার গর্ভে ক্রমান্বয়ে পাঁচটি কন্যা সন্তান ও তিনটি পুত্র জন্মেছে।

ঈশানের পরিবার ভেবেছিল হিন্দুশাস্ত্রমতে রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তার কাজ মেয়েরা তো করতে পারবে না, সুতরাং এই সুযোগে তারা শ্রাদ্ধাধিকারী হিসেবে সম্পত্তির কিছুটা অংশ পাবে। কিন্তু বড় মেয়ে নীলমণিকে বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই রাখায় তারা মনে মনে ক্ষোভে দুঃখে জ্বলে পুড়েছে। নীলের মৃত্যুর মাত্র ছয় মাসের মধ্যে রাজচন্দ্রেরও মৃত্যু ঘটে। এই উপন্যাসে এত মৃত্যু দেখানো হয়েছে, যার ফলে কাহিনির গতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। একটি বিপদ থেকে উত্তোরণের আগেই আরেকটি বিপদ এসে হাজির হয়েছে। ঘর জামাই উল্লাস তার মোক্ষম চালটা খেলে, শাশুড়িকে কথার ফাঁদে ফেলে তীর্থভ্রমণের জন্য নিয়ে যায়। সেখানে তার আসল চেহারাটা প্রকাশ পায়, সে সম্পত্তির লোভে

নবদুর্গাকে বিয়ে করতে চায়। বাড়ি ছেড়ে দূর দেশে অসহায় হৈমর কাছে বিকল্প কোনো পথ খোলা ছিল না। তিনি একপ্রকার বাধ্য হয়েই চল্লিশ বছরের উল্লাসের সঙ্গে নাবালিকা নবর বিয়ে দেন।

> "আপনি অবশ্য জানেন না, এই কাশীতে কত কিছুই হয়। এখানে পুণ্য এবং পাপ হাত ধরাধরি করে চলে। তাই দেখবেন আপনার সুন্দরী মেয়ে হঠাৎ চড়াদামে বিকিয়ে গেছে। আপনি টেরও পাবেন না আর আপনাকেও কোন ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। আপনার আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকবে না। দেশে ফিরে গিয়ে বলব, কলেরায় আপনারা মা, মেয়ে মারা গেছেন। তীর্থে এমন হয়েই থাকে। কেউ অবিশ্বাস করবে না।"[৭]

লেখকের জীবনবোধ বড়ই গভীর, তিনি সময়ের ধারায় তার চারপাশকে অবলোকন করেন। তিনি সেই সময়কার কিছু পারিবারিক, সামাজিক ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে উপন্যাসে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরলেন, যা একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষে, মানবতার পক্ষে বাঁধা স্বরূপ। পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা, পুত্রের প্রতি অধিকমাত্রায় অনুরাগ সার্বিকভাবে একটি জাতিকে পিছিয়ে রাখে। হৈম গঙ্গার দুটি যমজ কন্যা সন্তান হওয়ায় খুশি নন, তিনি ছেলে হলে বেশি খুশি হতেন। উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে মেয়েদের কোনো সুযোগ ছিল না। গঙ্গার যে বাস্তবিক জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তার যে ধারণা সে যদি উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেত, তবে সে মানুষের জন্য অনেক কিছু করে যেতে পারত। এখন সে শুধু নিজের পরিবার, পরিজনদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে বাবার বাড়িতে এসে সমস্ত হিসাব বুঝে নিয়েছে, সঠিকভাবে সম্পত্তির পর্যবেক্ষণ শুরু করে।

মুকুল খাসনবিশ তার সমকালকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই তার লেখায় বেশ কিছু বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি মানুষের যাপন প্রণালীকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলে মানুষের হৃদয়ের খবরও তিনি পেয়েছেন। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর ভাব ও ভাষায় সেই আভাসটুকু প্রকাশ পেয়েছে। কম বয়েসে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, যৌবন আসতে না আসতেই বিধবা হয়ে যাওয়া, শাস্ত্রীয় ধর্মের নামে বিধবা মেয়েদের অধিকার খর্ব করে দেখানো ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। ফুলের মতো স্বচ্ছ অবুঝ দুটি বিধবা মেয়ে নবদুর্গা ও গুণবতীর জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। তাদের চাল চলনে, কথা বার্তায় সর্বদা নজরদারি করা ইত্যাদি সেই সময়কার ঘোর অন্ধবিশ্বাসকেই প্রমাণ করে। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে আজকের সমাজ ব্যবস্থায় কী বিধবা মেয়েরা পুরোপুরি স্বাধীন। তারা কী নিজেদের মতো করে বাঁচতে পারে? উত্তরটা হবে সামান্য কিছুটা সুযোগ কিংবা ছাড় তারা পেয়ে থাকতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি। এইভাবেই একটি লেখার সঙ্গে অখণ্ড সময়ভাবনার রূপটি প্রকাশ পায়।

একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মর্মবেদনার দিকটি উপাখ্যানে বারকয়েক উঠে এসেছে। প্রথমে রাজচন্দ্র তার মেয়েদের বিয়ে দেওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন, পরবর্তী সময়ে গঙ্গার স্বামী কোটিশ্বর মেয়েদের সুপাত্রে দান করার বিষয় নিয়ে দুর্ভাবনায় ছিলেন। সেইসঙ্গে পণ প্রথার মতো জ্বলন্ত বিষয়টিও একজন বাবাকে ভিতর থেকে আঘাত করে।

> "ভাগ্যগুণে মোটামোটি পছন্দের একটি পাত্র জুটেও গেল। তবে দাবীদাওয়াটা বড় বেশী। কিন্তু কি আর করা যাবে। দাবীদাওয়াটা মেনে নিতেই হল। একইরাতে দুই যমজবোনের বিয়ে হয়ে গেল ঠিক যেমন বিয়ে হয়েছিল নীলমণি ও গঙ্গার। এতদিনে কন্যাদায়মুক্ত হলেন কোটিশ্বর।"[৮]

অর্থাৎ একজন বাবা কতটা অসহায় হলে, হতাশায় থাকলে বেশি টাকার বিনিময়ে হলেও মেয়েকে কোনোরকমে বিদায় দিতে পারলে মুক্ত হন, সেই ছবিটি এখানে ধরা পড়েছে। কারণ, তাকে পাঁচ পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে, তা সামান্য ঘটনা নয়। ঔপন্যাসিক সমাজের আরেকটি গুরুতর বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। কোনো পরিবারে বউ মারা গেলে সেটি সেরকমভাবে দাগ কাটে না। কারণ বউ মারা গেলে পুরুষ নিজের ইচ্ছে মতো আরেকটি বিয়ে করতে পারে, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে অনেক বাঁধা বিপত্তি থাকে। সেই নেতিবাচক মানসিকতাটি দীর্ঘবছর ধরে সমাজের মেরুদণ্ডটিকে সোজা করতে দেয়নি। আজও এর রেশ সমাজের চোরা স্রোতে বহমান।

ঔপন্যাসিক যেহেতু বৃহত্তর পারিবারিক ক্যানভাসে এই উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করলেন, সুতরাং তার বাহ্যিক পরিমণ্ডলে যেমন ঘটনার টানাপোড়েন রয়েছে, তেমনি তার অভ্যন্তরের ঘাত প্রতিঘাতটিও সহজে অনুভ করা গেছে। তিনি একই সঙ্গে সাংসারিক ঈর্ষা, হিংসা, দলাদলি, বিবাদকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও উত্থান ও পতনের কাহিনিকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ঈশানের পরিবারের সঙ্গে রাজচন্দ্রের পরিবারের সংঘাতের ঘটনাটি সমগ্র উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। জাল দলিলকে হাতিয়ার করে যেভাবে মজুমদার পরিবার বিতর্কিত অংশ হাতিয়ে নিয়েছে তাতে রায় পরিবারের পক্ষে উঠে দাঁড়ানো মুস্কিল হয়ে পড়ল। সেই খাদের কিনারা থেকে পরিবারটি শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেও, এর জন্য তাদের পরিবারের সদস্যদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

একজন লেখক শুদ্ধ অনুভবের দ্বারা বিষয়কে নির্বাচন করেন, ফলে তার সঙ্গে উপলব্ধির সমন্বয় ঘটবে, সেটি স্বাভাবিক ব্যপার। সেই স্বাভাবিক নিয়মেই কাহিনিটি বাস্তব রূপ লাভ করে এবং তার চরিত্রগুলো হয়ে উঠে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। সেই দিক থেকে চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়ে সমকালের শারীরিক ও মানসিক ভাবনাগুলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি লেখক চরিত্রের উঠানামাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারেন তবে সেগুলো কালের ধারায় হারিয়ে যাবে, চরিত্রগুলো সফলতা পাবে না। এই উপন্যাসে এমন কিছু চরিত্র রয়েছে যারা আগাগোড়াই সৎ অথবা অসৎ। সেইসব চরিত্রের অভ্যন্তরীণ কোনো পরিবর্তন উপন্যাসে দেখা যায়নি। বিশেষত ঈশানের পরিবারের সদস্যরা, গঙ্গার বড় ছেলে মহেশ প্রমুখ। কিছু ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার আবহ তৈরি হলেও লেখক সেগুলোকে নিয়ে আর ভাবেননি। নতুবা শৈল ও দেবেন্দ্রকে নিয়ে কিংবা নবদুর্গার মধ্য দিয়ে তার একটি প্রবল সম্ভাবনা ছিল।

> "আসল কথা হল মা বাপের শিক্ষা। স্নেহলতা সঙ্গে করে যৌতুক এনেছে অনেক কিন্তু শীল আনতে পারেনি। কিন্তু সরযূ অলস অকর্মন্য যাই হউক যৌতুকের সঙ্গে শীলটুকু নিয়ে এসেছে। আর শৈল? তার সঙ্গেতো এদের তুলনাই চলে না। মেয়েদের মধ্যে তিন বউকে নিয়ে এরূপ নানা আলোচনা হয়।"[৯]

আলোচ্য উপন্যাসে দুটি দেশের বিভিন্ন জায়গার প্রসঙ্গ ঘটনাচক্রে ধরা পড়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বৃহত্তর বাংলাদেশের কথা যেমন আমরা আলোচ্য উপন্যাসে পেয়েছি, তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী ত্রিপুরার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে । জীবনের তাগিদে, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে, এক শ্রেণির মানুষ ওপার ছেড়ে এপারে এসেছেন ও এখানে প্রতিষ্টিত হয়েছেন । ১৯৪৬ ও ১৯৫০ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্রটি আলোচনাচক্রে স্থান পেয়েছে। সেইসঙ্গে জাতিধর্মের উপরে উঠে মানবতার কাণ্ডারী পরোপকারী অধ্যাপক সামসুল হককে হত্যা করার ঘটনাটিও আমাদের মনকে উজ্জীবিত করেছে । কালের অখণ্ড স্রোতে কীভাবে রাজচন্দ্রের দৌহিত্রবংশ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে শেষ পর্যন্ত যে টিকে ছিল তার একটি ইতিহাস লেখক এখানে তুলে ধরলেন।

> "তবে আমি ওদের চাকরীর একটা চেষ্টা করতে পারি। তবে চাকরী হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। মানুষ শুধু চেষ্টাটুকুই করতে পারে। কাছাকাছি রাজ্য ত্রিপুরায় আমার অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। শুনেছি ওখানে চাকরীও সহজে মিলে, আপনার মত থাকলে আমি সেখানে আপনার মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আর চাকরী যোগাড় করে দেওয়ার মত আমার জানাশোনা লোকও সেখানে আছে।"[১০]

গতিময় জীবন ও বৃহত্তর সময়ের টানাপোড়েনের সঙ্গে লেখক উপলব্ধির সমন্বয় সাধন করে এই উপন্যাস রচনা করলেন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সৃজন করলেন, সেটাও আমাদের বড় পাওনা। ত্রিপুরার কথাসাহিত্যের অঙ্গনকে তিনি নতুন ভাবনায় ভিন্ন কলেবরে, দেশকালের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পেরেছেন এখানেই তিনি সার্থক ও সফল। তাঁর অসামান্য মেধা ও দক্ষতার গুণে 'পাঁচ পুরুষের উপাখ্যান' একদিকে বাংলা সাহিত্যের পাঠক মহলকে আকৃষ্ট করেছে, অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে গবেষণার দ্বার খুলে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট,

২০১০, পৃ. ৩১৬
২. খাসনবিশ, মুকুল, পাঁচপুরুষের উপাখ্যান, মানবী প্রকাশনী, আগরতলা-৭, পৃ. ১৩১
৩. ঐ, পৃ. ২
৪. ঐ, পৃ. ৩
৫. ঐ, পৃ. ১১
৬. ঐ, পৃ. ১২
৭. ঐ, পৃ. ৪১
৮. ঐ, পৃ. ৬৭
৯. ঐ, পৃ. ১২৪
১০. ঐ, পৃ. ২৫৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদক), বিংশ শতাব্দীর নারী ঔপন্যাসিক, পূর্বা প্রকাশনী, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০১২
২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে রূপ ও রীতির পালাবদল, ষাট বছরের বাংলা উপন্যাস (১৯৪৯ - ২০০৯), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১১
৩. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১ বৈশাখ ১৩৯২
৪. কাজী মাসুদা খাতুন, রবিউল আলম (সম্পাদনা), ২১ শতকের বাংলা উপন্যাস অন্বেষণ বীক্ষণ, বুকস স্পেস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০২১
৫. চন্দন কুমার কুণ্ডু, ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ বাংলা উপন্যাসের দর্পণে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২
৬. চিত্তরঞ্জন লাহা, মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৭
৭. জহর সেন মজুমদার, উপন্যাস : সময় সমাজ সংকট, বুকস স্পেস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১০
৮. ড. নির্মল দাশ, রমাপ্রসাদ দত্ত (সম্পাদিত), শতাব্দীর ত্রিপুরা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৫
৯. ড. শিশির কুমার সিংহ, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস (পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতক), অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৮
১০. স্বরাজ গুজাইত, বিনির্মাণ ও সৃষ্টি আধুনিক উপন্যাস, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-১, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭

অভিধান :

১. আকাদেমি বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮